কাছা

শৈলবালা গুহ দূর সম্পর্কে আমার মামী হন। সেই কোন ছেলেবেলা থেকে তার কথা শুনে এসেছি। মা বলতেন করালীমামার এত ঐশ্বর্য নামডাক সব নাকি শৈলমামীর কপালজোরে। ছিলো তো পল্টনবাজারের মোড়ে মাড়োয়ারীর দোকানের খাতাবাবু। শৈলবালাকে বিয়ে করে রাতারাতি কপাল ফিরে গেল। শৈলবালা তখনকার দিনের বি.এ. পাশ মেয়ে। যেমন চোখ ঝলসানো রূপ তেমনি স্মার্ট। "বিনা পণে বিয়ে করে ঠকলো," বলে যারা করালীমামার হয়ে আফসোস করেছিল তারাই মেয়ে দেখে একবাক্যে করালীমামার স্ত্রীভাগ্যের তারিফ জানিয়ে গেল। মা বলতেন করালীমামার ভাগ্যোদয় নাকি রূপকথার কাহিনীকেও ছাড়িয়ে যায়। বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই মাড়োয়ারীর ছোট দোকান ছেড়ে এক সিন্ধি কারবারে ঢুকে পড়লো করালীমামা এবং কালে কালে সিন্ধি মালিকের ডান হাত হয়ে উঠলো। কারবার উপলক্ষে প্রায়ই হিল্লী - দিল্লী - বম্বে পাড়ি দিতে হত তাকে। এরপর কয়েকটা বছরের কথা মার বিশদভাবে জানা নেই, তবে মামা যে খুব বড় কোম্পানিতে দারুণ উঁচুপদে অধিষ্ঠিত হয়েছে সে খবরটা আত্মীয় পরিজনেরা সকলেই রাখতো।

সেবার দিল্লীতে এসে সেই আশৈশবের গল্পকথার মামা-মামীকে চাক্ষুষ দেখার সুযোগ হল। আমার স্বামী পঙ্কজ তখন সদ্য ডি.ডি. কলেজে লেকচারার হয়ে ঢুকেছে। আমরা মেহরৌলিতে এক-কুঠরির ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে ঘর বাঁধলাম। মা করালীমামার ঠিকানা জোগাড় করে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু একেবারে অচেনা অদেখা মানুষের কাছে হুট করে আত্মীয়তার দাবী নিয়ে হাজির হতে সঙ্কোচ হচ্ছিল। হঠাৎই যোগাযোগ ঘটে গেল।

হাউজখাসে এক বন্ধুর বাড়ি নিমন্ত্রণ রক্ষা করে ফিরছি, রাস্তার ধারে প্রকাণ্ড আধুনিক ধাঁচের প্রাসাদতূল্য বাড়ি দেখিয়ে পঙ্কজকে বললাম, "জানো, এটা করালীমামার বাড়ি।"

ও বললো, "কি করে জানলে?"

"কেন, মা ঠিকানা দিয়েছিল না? ওই তো সতেরোর বি। ওই দ্যাখো নেমপ্লেট রয়েছে, করলীচরণ গুহ ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিপকো "

পঙ্কজ বাড়িটার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলো।

তারপর ঘড়ি দেখে বললো, "এখন সাড়ে পাঁচটা। বড় মানুষদের চা-পর্ব অর্থাৎ টি-টাইম চলছে এখনও। তা মামী দর্শনের পক্ষে অসময় নয়। কি বলো, যাবে নাকি ভিতরে?"

ঘন্টা বাজাতেই দরজার ওপাশে একজোড়া কুকুর ভীষণভাবে চেঁচামেচি জুড়ে দিল।

"নাতাশা, কোয়ায়েট! নো ব্রুটাস!!" তীক্ষ্ণ কন্ঠের ধমক সহ ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ করে দরজা খুলে গেল। চৌকাঠে জোড়া কুকুরের বগলস ধরে শৈলবালা মামী স্বয়ং। সেই চোখ-নাক-ভুরু। কি আশ্চর্য, অত বছর আগে তোলা ফটোর সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। আর কি স্মার্ট আর ফিটফাট, মা ঠিক যেমনটি বলেছিল। প্রণাম করে পরিচয় দিলাম।

সূক্ষ্ম ভ্রুকুটি রেখা চকিতে বিলীন করে স্মিত মুখে বললেন, "ওমা তাই বুঝি? তুমি অনিমাদির মেয়ে ঝুনু? নাতাশা, ব্রুটাস, নো!!"

সারমেয়দ্বয়ের গ্রাস থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের ড্রয়িংরুমে এনে বসালেন। ওঃ সে কি পেল্লায় ড্রয়িংরুম আর তার কি যে অপূর্ব সৌষ্ঠব, কি মনোহরা সজ্জাশ্রী ! ঢাউস গ্লাসে বরফের কুচি দেওয়া আম-সরবৎ সহযোগে সোহন হালুয়া আর নোনতা কাজুবাদাম খেয়ে সেদিনের মত বিদায় নিলাম। এরপর বহুবার গেছি সেখানে।

করালীমামা ও শৈলমামীর কোনও সন্তান ছিল না। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে কোনও ফাঁক ছিল না তাদের জীবনে। করালীমামা কোম্পানির কাজে অহর্নিশি ডুবে থাকতেন আর শৈলমামী প্রাণভরে সমাজসেবা করতেন। একসময় মহিলা আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসাবে ভগ্নিসংঘের নাম ডাক ছিল। শুনেছি সংস্থাটা গড়ে তোলার ব্যাপারে শৈলমামীর বিরাট ভূমিকা ছিল। যখনকার কথা বলছি অর্থাৎ আমরা যে ক'বছর দিল্লীতে ছিলাম, সে সময় শৈলমামীই ছিলেন সংগঠনটির কর্ণধার। চেয়ার পারসন্ কাম অ্যাকটিং জেনারেল সেক্রেটারী

হিসাবে ঝালে-ঝোলে-অম্বলে সবদিক সামাল দিয়ে বেড়াতেন। আরও অনেক কর্মী ছিল অবশ্য, শৈলমামীর খাতিরে আমিও দলে ভিড়ে গেছিলাম। কিন্তু তারা, অর্থাৎ আমরা তো রথ মাত্র। "ইচ্ছাময়ী তারা" যেমন চালাতেন সেইমত চলতো সবকিছু।

ওঁদের বাড়িতেই একখানা ঘর নিয়ে ভগ্নিসংঘের কার্যালয়। কাঠের পার্টিশনের এক ধারে রিসেপশন, অন্যদিকে মেন অফিসঘর। আমাকে শৈলমামী রিসেপ্শনিস্টের কাজে লাগিয়ে দিলেন। লোকজন আসার কামাই ছিল না। মেয়েরা আসতো নানাবিধ ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে। কার স্বামী মদ খেয়ে টাকাকড়ি উড়িয়ে দিচ্ছে, বাড়িতে বউ ছেলের নিরম্বু উপবাস। কারও স্বামী মদ খেয়ে অথবা না খেয়ে বউকে বেদম মারধোর করছে। কারও ঘরের মানুষ একদম লাপাত্তা, কিংবা অন্য পাড়ায় অন্য মেয়েমানুষে মতি তার। কোন কোন স্বামীরা আবার নিজের সাবেক বাড়িতেই মেয়েছেলে এনে তুলেছে। আমার কাজ ছিল প্রত্যেকের বক্তব্য নম্বর দিয়ে খাতায় তোলা। তারপর সেই সব মহিলাদের নির্ধারিত নম্বরওলা কার্ড দিয়ে নম্বর অনুসারে সময় দেওয়া। কখন কোনদিন শৈলমামী কার সঙ্গে কতক্ষণ কথা বলবেন কার্ডের নম্বর অনুযায়ী হাজিরা দেবে তারা। ইতিমধ্যে রেজিস্টারের খাতা অফিসের অন্য মহিলারা দেখেশুনে মন্তব্য নোট করবেন।

বিভিন্ন মহিলাদের বিভাগ ভাগ করে দিয়েছিলেন শৈলমামী। মদ্যপ স্বামী নিয়ে ডীল করবে একজন, হাড়কিপ্টে স্বামীর ডিপার্টমেন্ট আলাদা; মারখুট্টে বা অস্থিরমতি স্বামীদের জন্য আবার অন্য ব্যবস্থা। দুঃখী মেয়েদের সাহায্যার্থে আরও অনেক কার্যকলাপ পরিচালনা করতো ভগ্নিসংঘ। তাদের আইন আদালত সম্বন্ধে অবহিত করা, অল্পবয়সী মেয়েদের জুডো - ক্যারাটে শেখানো। এছাড়া মেয়েদের অধিকার সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে মিটিং-মিছিল-হরতাল-পিকেটিং-প্রেস রিলিজ এসব তো হামেশাই লেগে থাকতো কিছু না কিছু।

সংঘের কার্যোপলক্ষে যাদের সংস্পর্শে এসেছিলাম তাদের মধ্যে শ্রীলতা পাঠককে ভারী ভাল লেগেছিল সেই গোড়া থেকেই। শান্ত সাদাসিধে মানুষ। স্বামী সরকারী কেরানী। তিনটি ছেলেমেয়ে। ছেলেমেয়ের পড়াশোনোর খরচ, বাড়ি ভাড়া, এতগুলো প্রাণীর খাওয়াপরা -

ওষুধপত্তর, লোক লৌকিকতা। কেরানী স্বামীর সামান্য আয়ে কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলতো। সারা সংসারের সব কাজ সেরে তারি মধ্যে শ্রীলতা নিয়মিত ভগ্নিসংঘের অফিসে হাজিরা দিতো। বস্তিতে বস্তিতে গিয়ে দুস্থ মেয়েদের খোঁজ নেওয়া, তাদের দিয়ে আচার-বড়ি-পাপড়-গুড়ো মশলা বানানো, সে সবের জন্যে কাঁচামাল জোগাড় করা, তৈরী জিনিষগুলোর যথাযথ বিলিব্যবস্থা করা, মিছিল -পিকেটিং'এর জন্যে ইশ্‌তিহার বানানো, এবংবিধ যে কোন কাজে যখনই প্রয়োজন পড়তো অসংকোচে এগিয়ে যেতো শ্রীলতা। দারুণ খাটতে পারতো এবং তার মধ্যে 'অহং'-ভাবের ছিটে ফোঁটা ছিল না। সবার সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করতো। যে কোনও পরিবেশে মানিয়ে নিতো নিজেকে, কোনরকম ঝক্কি-ঝঞ্ঝাট খাড়া না করে।

এ-হেন মানুষ বেশ কিছুদিন অফিসে না আসায় ভারী অবাক হয়ে গেছিল সবাই। কে জানে অসুখ বিসুখই হল নাকি ! শ্রীলতার বাড়ি সেই শাহদ্‌রায়। সেখানে গিয়ে খবর আনার মত সময় বা উৎসাহ নেই কারও। আর ক'টা দিন দেখাই যাক না ! এর কিছুদিন পরে এলো শ্রীলতা। এসেই সোজা দুদ্দাড় করে অন্দরে চলে গেল, একেবারে শৈলমামীর খাস কামরায়। অফিসে বসে সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করছি এমন সময় শৈলমামী চাকর দিয়ে তলব পাঠালেন। শৈলমামীর সাজঘরে ঢুকে দেখি শ্রীলতা আঁচলের খুঁটে চোখ মুছছে আর শৈলমামী থমথমে মুখে বসে আছেন আয়নার দিকে পিঠ করে। আমার সঙ্গে সংঘের চাঁই চাঁই আরও দু'তিনজন মহিলা ছিল। শৈলমামী আমাদের সবাইকে শোনালেন ব্যাপারটা।

শ্রীলতার ভিজে বেড়াল কেরানী স্বামীর কীর্তি কাহিনী। ভদ্রলোক দশটা-পাঁচটা অফিসই শুধু করতেন না, সেই সঙ্গে দিব্যি রাসলীলাও চালিয়ে গেছেন। স্ত্রীপুত্র পরিবার কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি কিছু। এখন তার সেই 'মতি গোয়ালিনী' বিপদে পড়ায় কেলেঙ্কারী চাপা দিতে বিয়ে করে ঘরে তুলেছেন তাকে। হ্যাঁ, শাহদ্‌রার সেই সাবেকি ফ্ল্যাটেই আসন্ন প্রসবা নববধূসহ হাজির হয়েছেন বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত।

শ্রীলতা কঁকিয়ে কেঁদে উঠলো, "শৈলদিদি আপনি আমাকে বলে দিন আমি কি করবো। উঃ কি ঘেন্না! কি লজ্জা!! কি নিদারুণ অপমান!!!"

শৈলমামী বললেন, "খবরদার কাঁদবে না শ্রীলতা। যুদ্ধক্ষেত্রে কাঁদতে

নেই। এতকাল নাকে কেঁদেই নিজেদের কেস কাঁচিয়ে দিয়েছি আমরা। পুরুষজাত কান্না চেনে না, চেনে শুধু মুগুর। বুঝলে? তোমার বর বাছাধনকে মজা চাখিয়ে ছাড়বো আমি। সরকারী কেরানী বলছিলে না? অফিসের ঠিকানা লিখে দাও, কালই ভগ্নিসংঘ থেকে অফিসের সামনে ভুখ্ হরতাল আর প্রদর্শন সুরু হয়ে যাবে। যদ্দিন না ওকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করছে আমরাও খুঁটি গেড়ে বসে থাকবো, পাদমেকম্ ন নড়ামি।"

যেই কথা সেই কাজ। পরদিনই লিপিভবনের সামনে তাঁবু গেড়ে ভগ্নিসংঘের কর্মীরা রিলে করে ভুখ্ হরতাল শুরু করে দিলো। বড় বড় পোস্টার নিয়ে পায়চারী করতে করতে হুঙ্কার তুললো, "ডবল বিয়ে চলবে না, চলবে না।" "স্বামীর জুলুম চলবে না, চলবে না।" "সুধীর পাঠক আহম্মক, চলে যাক সোজা নরক।" তা ভগ্নিসংঘের আন্দোলনে কাজ হত যদি না তীরে এসে তরী ডুবতো অমন শোচনীয় ভাবে। ভারী করুণ নিদারুণ সেই কাহিনী। পরপর দু'দিন ধরে মহিলাদের প্রদর্শন চললো।

তৃতীয় দিনে খোদ উপরওলা সুধীর পাঠককে ডেকে পাঠালেন, "এ সব কি শুনছি হে?"

সুধীর মিনমিন করে কি যেন বললো।

উপরওলা মাথা নেড়ে বললেন, "ও সব কথা আগে ভাবা উচিত ছিল, এখন আর চারা নেই। এনকোয়ারী হবে। যদি প্রমাণ হয় যে তুমি বাড়িতে বউ রেখে এদিক সেদিক ফষ্টিনষ্টি করে বেড়িয়েছ তবে অসচ্চরিত্রতার দরুন তোমায় সাসপেণ্ড করা হবে। আর যদি প্রমাণ হয় যে পরকীয়া নয়, দুনম্বর মহিলাটিও তোমার বিয়ে করা বউ, তাহলে চরিত্রহীনতার অপবাদ থেকে তুমি বাঁচবে কিন্তু তোমার চাকরী বাঁচবে না। এই হল গিয়ে কথা।"

এনকোয়ারী শুরু হল। এনকোয়ারী আর কি, বামাল সমেত গরুচোর তো একেবারে সামনেই এক পায়ে খাড়া। পাঠকের বাড়িতেই রয়েছেন সেই দুই নম্বর মহিলা। ইতিমধ্যে, এনকোয়ারী পুরো হবার আগেই পাঠক সাইকেল রিক্সায় চাপিয়ে ভর্তি করে এলো তাকে। সুভালাভালি প্রসব টসব হয়ে গেলে প্রসূতি ও নবজাতককে বাড়ি নিয়ে এলো দু'দিন পরে। হাসপাতালে নাকি বেড নিয়ে কাড়াকাড়ি। বিশেষ করে লেবার ওয়ার্ডে তিলার্ধ স্থান নেই। এর পরেও আর সুধীর পাঠক পালাবার পথ পায়? আর কদ্দিন চাকরি থাকবে তার? উপর থেকে অর্ডার আসতে

ক'দিন লাগে?

শেষ অবধি কিন্তু কিছুই হল না। সুধীর পাঠক বহাল তবিয়তে বহাল রইলো।

ভগ্নিসংঘের অফিসে কানাঘুষো শোনা গেল শ্রীলতা নাকি সুধীরের বড়কর্তার পা চেপে ধরেছিল, "দোহাই স্যার, আমার স্বামীর চাকরিটা খাবেন না।"

শাহদ্রার ক্ষুদ্র ফ্ল্যাটখানায় ওরা পাঁচজন ছাড়া নতুন প্রসূতি আর তার নবজাত শিশু। বাড়িওলা ভাড়াটের চাকরি যাবে শুনে আগে-ভাগেই নোটিশ দিয়েছে। ছেলেমেয়েরা স্কুল কামাই করে বাড়িতে বসে আছে। এরপর আর স্কুলের ফি দেবে কে, দু'বেলা দু'মুঠো খাবারই বা জুটবে কোথা থেকে ----।

শৈলবালা মুখ কালো করে বসে থাকেন।

টেবিলে ঘুঁষি মেরে বলেন, "গাট্স্ চাই, বুঝলে? এতটুকু গাট্স্ নেই। ছোঃ !"

এর কিছুদিন পরে পঙ্কজের চাকরিটাও গেল। কাকে জানি চড় মেরেছিল। সারা কলেজময় স্ট্রাইক। শুধু ডি.ডি. নয়, রাজধানীর যতেক কলেজে ছড়িয়ে পড়লো সে স্ট্রাইক। অথচ দোষ পঙ্কজের নয়। চড়টা সে মেরেছিল বটে কিন্তু কেন কি কারণে তা লিখতে গেলে এ কাহিনী কোনদিন ছাপা হবে না। সেন্সরে আটকে যাবে, এমন অকল্পনীয় বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার সে সব। কিন্তু সে কথা কাকে বলবে? সে কথা কি বলা যায় ! অতএব বাক্স-বিছানা বেঁধে পাত্তারি গুটোতে হল আমাদেরই। কাউকে কিছু না বলে চুপি চুপি কলকাতামুখো ট্রেনে উঠে বসলাম একদিন।

এরপর অনেক দিন শৈলমামীর কোন খবর রাখিনি। ভগ্নিসংঘের কার্যকলাপ খবরের কাগজে গোড়ার দিকে চোখে পড়তো মাঝে মাঝে। গত ক'বছর ধরে তারও কোন উচ্চবাচ্য নেই। কিছুদিন আগে সুপ্রীম কোর্টে শা'বানুর কেস নিয়ে দেশজোড়া হৈ চৈ হতে ভগ্নিসংঘের কথা মনে পড়ে গেল। শৈলমামীর মনের মত কাজ এটা। সংঘের মেয়েদের নিয়ে খুব বোধহয় পিকেটিং ভুখ্ হরতাল করছেন আশ মিটিয়ে। কিন্তু

কই কাগজে তো লেখে না কিছু !

শীতের সময়টা মা এলেন। দুটো মাস আমাদের কাছে কাটিয়ে যাবেন। শৈলমামীর নাম করতে বললেন, "ওমা, তুই বুঝি শুনিসনি কিছু? শৈল তো এখন জামতাড়ার ভিটেয় এসে উঠেছে। আহা রে, বড় কষ্ট তার। কোনমতে দিনপাত হয়।"

"কেন? করালীমামা তো বড় চাকরি করতো ! অত ঐশ্বর্য বাড়ি গাড়ি টাকাকড়ি সব গেল কোথায়?"

মা হতাশ হয়ে বললেন, "ও হরি, তুই তো দেখছি কিছুই জানিস না। করালী তো স্বামী ব্যোমকেশের চেলা হয়ে মানালী না পাঞ্জিম কোন চুলোয় চলে গেছে। স্বামী ব্যোমকেশকে তো জানিস, না কি তাও জানিস না? সেই যার চেলাচামুণ্ডারা টিয়া রঙের জামাকাপড় পরে হুপসো গরমে কস্ফর্টার জড়িয়ে ঘুরে বেড়ায়। গণ্ডায় গণ্ডায় ভৈরবী থাকে তাদের। কত মেমসাহেব ভৈরবীও আছে নাকি।"

"শৈলমামী কিছু বললো না?"

"কি আবার বলবে। করালী সব আটঘাট বেঁধে রেখেছিল তলায় তলায়। বাড়ি গাড়ি সব মর্টগেজ করে ব্যাঙ্কের যত টাকা তুলে পাচার করে দিয়েছে আগে থেকে।

"শৈল নিজের অংশ দাবী করে কেস করেছিল। করালীর উকিল কোর্টে দাঁড়িয়ে বললো, 'হুজুর, আমার মক্কেল কপর্দকশূন্য সন্ন্যাসী। ইহসংসারে তার কানাকড়িটিও নেই। তার আবার অংশ কি?' শৈল একটা স্যুটকেস সম্বল করে জামতাড়ার ভাঙা বাড়িতে এসে উঠলো। ব্যাঙ্কের লকার থেকে ওর যত গয়নাগাঁটি সব আগেই লোপাট করে দিয়েছে করালী। এমন কি বাড়ির দামী আসবাবপত্তর বাসনকোসন, শৈলর পোশাক-আশাক সাজগোজের জিনিস কিছুই অবশিষ্ট নেই। সব চুরি হয়ে গেছে। লোকে বলে করালীরই কারসাজি সে সব।"

"শৈলমামীর তাহলে চলে কি করে?"

"এ সংসারে দুঃখী মানুষদের যে করে চলে। চেয়ে চিন্তে, কুড়িয়ে বাড়িয়ে।"

"কেন, শৈলমামী তো বি.এ. পাস করেছিল !"

"তা করেছিল বৈকি। ভারী মেধাবী ছিল। ওর বাবা নাকি বলতো মেয়েকে আই.এ.এস. পরীক্ষায় বসাবে। জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হবে মেয়ে। তা সুযোগ পেলে হতেও পারতো। কিন্তু ওই যে বলে কপাল। কোন ফাঁকে করালীর সঙ্গে ভাবসাব হয়ে গেল। বেঁকে বসলো বিয়ে করবে বলে। এখন এই বয়সে চাইলেই বা চাকরি পাচ্ছে কোথায়। তাছাড়া শরীর মন দুইই ভেঙে গেছে। চাকরি-বাকরি করার সামর্থ্যও নেই আর। করালীটা যে ভিতরে ভিতরে এমন হাড়বজ্জাত সে কথা আমরা কোনদিন কল্পনাও করিনি।"

মনে পড়লো শৈলমামী একদিন শ্রীলতাকে বকেছিলেন।

বলেছিলেন, "খবরদার কাঁদবে না, নাকে কেঁদেই মেয়েদের কেস কেঁচে গিয়েছে।" টেবিলে ঘুঁসি মেরে বলেছিলেন, "গাট্স্ চাই, বুঝলে?"

শৈলমামীর তো গাট্সের অভাব ছিল না। অথচ উনিও শ্রীলতার মতই মার খেয়ে গেলেন ----। অবাক হয়ে এই সব কথা ভাবছি, শুনলাম মা নিজের মনে বিড় বিড় করছেন - মেয়েদের জীবন হল শাঁখের করাত। আসতেও কাটে যেতেও কাটে। সাধে কি আর বারো হাত কাপড়েও তাদের কাছা জোটে না !